গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৭ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান মাও সে-তুঙ স্মরণে

জন্ম ঃ ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ মৃত্যু ঃ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

"সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলই হল কাগুজে বাঘ। প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখতে ভয়াবহ, কিন্তু বাস্তবে তারা অত শক্তিশালী নয়। ... এক সময় হিটলার কি খুব শক্তিশালী বলে বিবেচিত হত না? কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে সে ছিল কাগুজে বাঘ। এই একই রকম ছিল মুসোলিনি, ছিল জাপানি সাম্রাজ্যবাদও। ... এইসব প্রতিক্রিয়াশীলরা পরাস্ত হবে এবং আমরা বিজয়ী হব। কারণটা আর কিছু নয়, প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিক্রিয়ার, আর আমরা প্রতিনিধিত্ব করি প্রগতির।" মাও সে-তুং। আগস্ট ১৯৪৬

৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা এবং চীন বিপ্লবের রূপকার মাও সে-তুঙের ৪৪তম স্মরণ দিবস দলের উদ্যোগে দেশ জুড়ে পালিত হয়। সর্বত্র দলের অফিসে পতাকা উত্তোলন, প্রকাশ্য স্থানে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং তাঁর রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করা হয়। কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে পতাকা উত্তোলন এবং মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড শংকর সাহা। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

১০০ দিনের 'সাফল্য' জাহিরে ব্যস্ত সরকার

গরিবি-বেকারিতে জেরবার জনগণ

বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ৭০ বছরে কেউ যা করতে পারেনি ১০০ দিনেই তা করে দেখিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর মুখেও দেশবাসী শুনেছিল এমন কথা। বোঝা যায় আপন কৃতিত্বে মোহিত তাঁরা। কথিত আছে, নিজের সৌন্দর্যে মোহিত গ্রিক উপকথার রাজা নার্সিসাস শুধু মোহের ঘোরেই আত্মধ্বংসের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বিজেপি সরকার কি সে পথেই দেশকে নিয়ে চলেছে!

কী কী মহৎ কীর্তি গত ১০০ দিনে করে ফেলেছেন তাঁরা? তাঁরা কি দেশের কর্মক্ষম যুবশক্তির কর্মসংস্থানের কথা ভেবে কথাটা বলেছেন? নিশ্চিতভাবে বলা যায়— না। কারণ মোদি সরকারের আগের পাঁচ বছরেই বেকারত্ব ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে গেছে। আরও অতল খাদের দিকেই তার দৌড় অব্যাহত। দেশের সাধারণ মানুষের রোজগার কি বেড়েছে? বিজেপি সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়েছে দু'টাকা। আর এমপিদের বেতন দ্বিগুন বাড়িয়ে মাসে করেছে ১ লক্ষ টাকা, সব সুবিধা যোগ করে যা হয় মাসে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। রিলায়েন্সের মালিকদের আয় দিনে ৩০০ কোটি টাকাতে পৌঁছে দিতে

আটের পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে কলকাতায় ৫ সেপ্টেম্বর শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র বিক্ষোভ

প্রকৃত বামপন্থী ধারায় শক্তিশালী গণআন্দোলনই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে

আসামের গুয়াহাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

৫ আগস্ট আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস। ১৯৭৬ সালে এই দিনটিতেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তাঁর ৪৪ তম প্রয়াণ দিবস। প্রতি বছর এই দিনটি আমরা উদযাপন করি একটি বিপ্লবী উদ্দেশ্যবোধ থেকে। একটি গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য এর মধ্যে নিহিত আছে। এই দিনে আমরা গভীর ভাবে তাঁর চিন্তার চর্চা করি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমাদের বৈপ্লবিক কর্তব্য নির্ধারণ করি, এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্ণয় করি এবং একই সাথে তাঁর চিন্তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্রুত সম্পন্ন করার সংকল্প আরও একবার গ্রহণ করি। সেদিক থেকে এই উদযাপন কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়, বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ একটা রাজনৈতিক ক্রিয়া।

সর্বাত্মক সংকট জনগণকে আচ্ছন্ন করছে

আজ আমরা যখন ৫ আগস্ট উদযাপন করছি, তখন আমাদের দেশ তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতীব কঠিন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই এক গভীর সংকট বিশ্বের সকল জনসাধারণকে ঘিরে ধরেছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মূল দিকটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার কোনও অবলম্বনই খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে যে সমস্যা মানুষকে পুড়িয়ে মারছে, তা হচ্ছে মানুষের জীবিকা নির্বাহের সমস্যা। মানুষ যদি না কোনও উপযুক্ত কাজ খুঁজে পান, তা হলে বেঁচে থাকতে পারেন না। এই জন্য মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জীবিকা নির্বাহের একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা। জীবিকা নির্বাহের

দুয়ের পাতায় দেখুন

মেট্রো রেলে ধস

ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি

৩১ আগস্ট ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলের টানেলে বিপর্যয়ের কারণে কলকাতার বউবাজার এলাকায় বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং আরও বহু বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় রয়েছে মানুষ। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, প্রথমত, কলকাতার ওই অঞ্চলে গাঙ্গেয় পলি ও বালির স্তর অনেক নিচে পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এখানে আঞ্চলিক অ্যাকুইফার থাকার প্রবল সম্ভাবনা। সেজন্য টানেলের রুট ম্যাপ করার সময় ভূ-প্রযুক্তিগতভাবে আরও বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল যাতে নিখুঁতভাবে আঞ্চলিক অ্যাকুইফার নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের গাফিলতি ক্ষমার অযোগ্য। দ্বিতীয়ত, ঘনবসতিপূর্ণ এমন অঞ্চলের নিচ দিয়ে যখন টানেল নিয়ে যাওয়া হয় তখন শুধুমাত্র উপরে যন্ত্র লাগিয়ে কম্পন বা বিকৃতি মাপার ব্যবস্থা রাখলেই চলে না, সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থাও রাখা ছিল অত্যন্ত জরুরি যা মেট্রো কর্তৃপক্ষ রাখেনি। ফলে বিপর্যয় বুঝতে ও মোকাবিলা করতে বেশ কয়েকদিন চলে যায়। ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে

আটের পাতায় দেখুন

শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সামনে বাধা পুঁজিবাদ

একের পাতার পর

পথ বলতে কেবল সরকারি বা বেসরকারি চাকরিকেই বোঝায় না। অর্থনৈতিক স্থিরতা থাকলে, কায়িক এবং মানসিক এই দুই ধরনের শ্রমের মাধ্যমে মানুষ কোনও না কোনও বস্তু বা সেবা, কিছু না কিছু উৎপাদন করে জীবন ধারণ করতে পারেন। সরকারি বা বেসরকারি চাকরি তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা মাত্র। মুখ্যত মানুষের জীবিকা নির্বাহের পথ সৃষ্টি হয় শিল্পোন্নয়নের দ্বারা। জীবনধারণের আরেকটি বড় মাধ্যম হচ্ছে কৃষিকাজ। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতি জমির পরিমাণ দ্রুত কমছে এবং তার মধ্য দিয়ে জীবনধারণ আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও দেশের সর্বত্র চাষিরা তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। সমস্যা এতটাই মারাত্মক যে উৎপাদন খরচের উপর একটু বাড়তি আয় দূরে থাকুক, বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষিরা উৎপাদনের খরচটাই তুলতে পারছেন না। অথচ তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি যখন শহর অঞ্চলে যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরা কৃষকের কাছ থেকে কম দামে কিনে তার থেকে ৭/৮ গুণ বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা লুটছে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি তাঁরা পাচ্ছেন না, বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছেন। সেই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে তাঁদের অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। আমাদের দেশে জনসংখ্যার যে ৭০-৮০ শতাংশ মানুষ একসময় কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাদের একটা বড় অংশ আজ উদ্বৃত্ত। গ্রামে তাঁদের কোনও কাজ নেই। ফলমূল উৎপাদন, কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, রেশম চাষ ইত্যাদি করে চাষিরা কোনও রকমে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও টিকে থাকতে পারছেন না। এই অবস্থায় কোনও কিছু পাওয়ার আশায় তাঁদের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলে যাচ্ছেন।

আপনারা লক্ষ করছেন, একটা সর্বাত্মক সংকট দেশের জনগণকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সংকটের তীব্রতা এমনই যে, যেখানে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পরিবারের একজন কাজ করলেই গোটা পরিবারের ভরণ পোষণ চলত, সেখানে আজ স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই মিলে কাজ করেও সংসার চালাতে পারছেন না, বেঁচে থাকতে পারছেন না। গ্রাম ছেড়ে মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরের দিকে পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু শহরেও আজ আর কাজ নেই। নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠা দূরের কথা, ব্রিটিশ আমলে যেগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলিও আজ পুঁজিবাদের সংকটগ্রস্ত যুগে একটার পর একটা বন্ধ হচ্ছে। স্বাধীনতার পর দেশের জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে কয়েকটা শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলোও হয় বন্ধ হয়ে গেছে, না হয় জলের দামে পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহের কোনও পথ নেই। শিল্পোৎপাদনের সূচক ক্রমাগত নিম্নগামী। উৎপাদিত বস্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে না, কারণ চাহিদা নেই। চাহিদা নেই, কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে মালিকরা শ্রমিককে কম মজুরি দিয়ে শোষণ করে, আবার আরও বেশি মুনাফার লোভে শ্রমিক ছাঁটাই করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে। ফলে বাজারে জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা শ্রমিকদের থাকে না, চাহিদা কমে যায়। আর শ্রমিক ও দুঃস্থ কৃষক নিম্নবিত্তরাই তো জনসংখ্যার ৯৫ ভাগ। তাদের আয় শূন্য। এই অবস্থায় পুঁজিপতিরা উৎপাদন করতে চায় না। আর শিল্পোৎপাদন না হলে কর্মসংস্থান হয় না। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার গোলকধাঁধা।

জীবিকা নির্বাহই পুঁজিবাদী দেশে মূল সমস্যা

কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশ বলে পরিচিত আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি প্রতিটি দেশের বাস্তব চিত্র আজ একই। কাজের সন্ধানে মানুষ উন্মাদের মতো ঘুরছে। কিন্তু বাঁচার পথ পাচ্ছে না। তাই দিশাহারা মানুষ শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা বিশ্বে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জীবিকার দাবিতে প্রতিদিন রাস্তায় বেরিয়ে আসছে। উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই, তবুও মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করছে। তাদের দাবি একটাই, স্লোগান একটাই— বেঁচে থাকার পথ চাই, জীবিকা অর্জনের সংস্থান চাই। অপরদিকে এটাও লক্ষণীয়, শোষণ জর্জরিত এই অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কী— জানার আগ্রহও জনমনে ক্রমশ বাড়ছে। বলা বাহুল্য, এটার উত্তর মার্কসবাদ থেকেই পেতে হবে। মার্কসবাদ দেখিয়েছে, অবিরাম শিল্পোন্নয়ন চলতে থাকলে জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের কোনও সমস্যাই থাকে না। শিল্পের জন্য প্রয়োজন জমি, শ্রম, পুঁজি এবং প্রযুক্তি। মুখ্যত এগুলিই হচ্ছে উৎপাদনের উপায় বা উপাদান। আপনারা লক্ষ করছেন, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এই চারটি জিনিসই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের দেশেও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ এক কথায় সমস্ত রকমের কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে আছে। উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক শ্রম, যাকে ইংরেজিতে ইন্টেলেকচুয়াল লেবার বলা হয়, সেটাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দেশের ভিতর তাকে কাজে লাগানোর কোনও সুযোগ না থাকায় এই বৌদ্ধিক শ্রম অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। পুঁজিপতি শ্রেণির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য কাজ করার জন্যই সবকিছু থাকা সত্ত্বেও দেশে আজ শিল্প গড়ে উঠছে না। তারই ফলে বেকার সমস্যা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই এই বেকার সমস্যা বিস্ফোরক রূপ ধারণ করেছে। লক্ষ করুন পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন কোনও পত্রপত্রিকায় তার কোনও উল্লেখ নেই। এর মধ্যেও মাঝে মধ্যে যেটুকু খবর আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর সব পুঁজিবাদী দেশেই মূল সমস্যা, জীবন মরণ সমস্যা একটাই— জীবিকা নির্বাহের সমস্যা। পৃথিবীতে কোনও দেশেই নতুন কলকারখানা তো গড়ে উঠছেই না, যে কয়েকটি কোনও প্রকারে টিকে ছিল সেগুলিও দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জনসাধারণ কাজ করে, উপার্জন করে বেঁচে থাকতে চান। এর মধ্যে অন্যায় তো কিছুই নেই। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। এরা তো আমাদের বিরাট সম্পদ। কলকারখানা খুলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে, তাদের শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে তো দেশের চেহারা পাল্টে দেওয়া যায়। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা হচ্ছে না এবং হবেও না। সম্প্রতি একটা কথা চালু হয়েছে— 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার', 'শোয়িং দ্য ডোরস'— অর্থাৎ যত প্রকারে পারা যায় এবং যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করা। বেসরকারি ক্ষেত্রে তো কথাই নাই। উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনে সর্বত্র উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। ১০০ ঘণ্টার কাজ যন্ত্র এক ঘণ্টায় করে দিচ্ছে। এই প্রশ্নে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, যন্ত্রের ব্যবহার হবে কি না, হলেও কোথায় কতটুকু হবে। এই সব দিকগুলো সম্পর্কে তো সরকারকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যন্ত্রের ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের দেশের মানুষ, গরিব জনসাধারণ যদি না খেয়ে মারা যান তাহলে এই পথে আমরা যাব কেন? এটা তো বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি ঘটুক কাম্য। কিন্তু সে তো মানুষের জন্যই। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, আধাসরকারি, সরকারি অফিসগুলোতে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে লাখ লাখ কর্মচারী কাজ হারাচ্ছে। অন্য দিকে, যারা আছে তাদেরও স্বেচ্ছায় অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজ, সরকারি হাসপাতাল সর্বত্র একই অবস্থা। ভারতীয় রেল বিশ্বের মধ্যে অন্যতম উন্নত বিশাল একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুরুর দিন থেকেই বহু মানুষ রেলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। ইতিমধ্যে সেখানেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বাকি যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মাথায়ও ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে। নামে সরকারি কিন্তু রেল বিভাগকে কার্যত পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মানুষের জীবনে চিকিৎসা ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। জীবন এবং চিকিৎসা এক এবং অভিন্ন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে চিকিৎসা ব্যবস্থার যতটুকু উন্নতি হয়েছিল সেটুকুও আজ আর নেই। প্রায় সবটুকু আজ ভেঙে পড়েছে। কোথাও কোথাও কিছু সংখ্যক সরকারি হাসপাতাল থাকলেও সেগুলোতে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাও পুঁজিপতিদের হাতে চলে গিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে, স্বাধীনতার পূর্বে তা লক্ষ করা যায়নি। ব্রিটিশ আমলে খুব বেশি স্কুল-কলেজ ছিল না ঠিক, কিন্তু যে ক'টা ছিল সরকারি ক্ষেত্রেই ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর যত দিন যাচ্ছে ততই গরিব জনসাধারণকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারিকরণ করার ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যে নগণ্য সংখ্যক গরিব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় এগিয়ে এসেছিল আজ তাও আর আসছে না। নানা চক্রান্ত করে এদের শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই তো দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির খুবই সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিচ্ছবি।

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের মালিকানাধীন প্রচারযন্ত্রকে বিপুল ভাবে কাজে লাগিয়ে এই নির্মম নিষ্ঠুর শোষণকে চাপা দিচ্ছে। দিনকে রাত, রাতকে দিন করছে। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানাবার চেষ্টা করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসক পুঁজিপতিরা এইভাবেই জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই বেকার। হয় পূর্ণ বেকার, না হয় প্রায় বেকার অথবা অর্ধ-বেকার। দেশের ৫০ শতাংশ মানুষেরই কোনও কাজ নেই এবং এর কোনও প্রতিকার নেই— এটাই যদি চলে তা হলে দেশের জনসাধারণের বেঁচে থাকার সুযোগ কতটুকু থাকল? এই ভয়ঙ্কর অবস্থা কি ভাববার কথা নয়? আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা মানুষের থাকে, ইচ্ছা থাকে নিজে পরিশ্রম করব, উপার্জন করব, উৎপাদন করব, ন্যায্য মজুরি পাব, নিজে বেঁচে থাকব এবং পরিবারের অন্যদেরও বাঁচিয়ে রাখব— সেই ন্যূনতম সুযোগ আজ দেশে কোথায়? সেটাই যদি না থাকে তা হলে মানুষের জীবনে আনন্দের উৎস কী থাকল?

নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে পুঁজিবাদ

অন্য দিকে এই তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের অনিবার্য পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট। পুঁজিপতিদের শোষণের ফলে মানুষ মরছে, কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা কি মনুষ্যত্ব নিয়ে বেঁচে আছেন? পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন খুলুন, দেখবেন কেবল হত্যা, খুন আর মারামারি। আমাদের প্রিয় নেতা এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু আগেই দেখিয়েছিলেন, বেঁচে থাকার কোনও সঠিক পথ না পেয়ে পুঁজিপতি শ্রেণিরই চক্রান্তে একাংশ মানুষ, ছাত্র-যুবকরা সমাজবিরোধীতে পরিণত হচ্ছে, অনৈতিক জীবনধারণের দিকে ঝুঁকছে। আপনারা দেখছেন আজ মানুষ মানুষকে মারছে। ভারতবর্ষে মানুষ হত্যা করা একটা জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে! অবস্থাটা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ভাবতে পারা যায়? সবচেয়ে মারাত্মক কথা হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের তাঁবেদার দলগুলিই মানুষকে এই পথে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ভেবে দেখুন আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ কি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে মানুষ মানুষকে মারবে, পিতা সন্তানকে হত্যা করবে বা সন্তান পিতা-মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করবে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করবে! অথচ স্বাধীনতার ৭৩ বছরে এমনই একটি দেশ, এমনই এক সমাজ সৃষ্টি করেছে পুঁজিপতিরা।

পুঁজিপতিদের শাসন শোষণের পরিণামেই তো এটা হচ্ছে এবং প্রতিদিন অবস্থার অবনতিও ঘটছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন, আজ কোনও পরিবারে সুখ নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। পরিবার বলতে আজ আর কিছুই নেই, সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক, স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক সবই টাকার সম্পর্ক। আর কেবল টাকার ভূমিকাই নয়, মানুষকে আজ ইতর প্রাণীর থেকেও অধঃপতিত স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। ইতর প্রাণী ধর্ষণ করে না। কিন্তু মানুষ আজ কী করছে। নারী ধর্ষণ, নারী পাচার, শিশু ধর্ষণ প্রতিদিন কী তীব্র আকার ধারণ করছে। অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, যখন তখন, যেখানে সেখানে বর্বর ধর্ষণের আশঙ্কা নিয়ে মহিলাদের ঘর থেকে বেরোতে হচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে এসব কি এমনি এমনিই ঘটছে, এই বর্বর কার্যকলাপের কোনও কার্যকারণ নেই? মানুষের যে খাওয়ার নেই, পরার নেই, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই এইগুলির কি কোনও কারণ নেই? বিজ্ঞান কার্যকারণবাদের কথা বলেছে। বলেছে, ঘটনা ঘটলে তার কারণ থাকবেই, আর কারণ থাকলে ঘটনা ঘটবেই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলছে কারণ একটাই— পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী নির্মম শোষণ। পুঁজিবাদ আজকে মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করেই মারছে না, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের তাঁবেদার সরকারগুলি মানুষের নীতি-নৈতিকতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ সবকিছু প্রতিদিন ধ্বংস করে চলেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, একটা জাতি খেতে না

তিনের পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ বৃহৎ পুঁজিমালিকদের স্বার্থেই

৩০ আগস্ট দেশের অর্থমন্ত্রী নতুন করে দশটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে চারটিতে নামানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১২টিতে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হচ্ছে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যার মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭,৯৪,৫২৬ কোটি টাকা। কানাড়া ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হচ্ছে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, মোট ব্যবসা দাঁড়াবে ১৫,২০,২৯৫ কোটি টাকা। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত হবে অন্ধ্র ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক। তাদের মোট ব্যবসা ১৪,৫৯,৪৩৪ কোটি টাকা। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, মোট ব্যবসা ৮,০৭,৮৫৯ কোটি টাকা। এর আগে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক সহ ছটি ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল দেনা ব্যাঙ্ক এবং বিজয়া ব্যাঙ্ক। এখনও যে ব্যাঙ্কগুলি বাকি রইল সেগুলি হল, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এবং পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক। সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অবশ্য বহু আগেই। উদার অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে সংস্কার করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত নরসিংহম কমিটির সুপারিশ মেনে ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

এত বড় সংযুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার পর অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য হল, 'অর্থনীতির ঝিমিয়ে পড়া দশা কাটাতে এবং ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্য পূরণ করতে সরকার যে সব পদক্ষেপ করছে, এই সংস্কার তারই অঙ্গ। এর ফলে অনাদায়ী ঋণের (এনপিএ) বোঝায় দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাঙ্কগুলিতে সরকার যে পুঁজি ঢালছে, তা আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে।' এর ফলে গ্রাহকদেরও যেমন কোথাও কোথাও অসুবিধা হবে তেমনি বহু কর্মচারীও যে উদ্বৃত্ত হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কারণেই অর্থমন্ত্রীর আশ্বাস, 'অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে যাওয়া ব্যাঙ্কে যাঁদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। কোনও কর্মীকে ছাঁটাইও করা হবে না।' প্রশ্ন হল, এই বক্তব্য বা আশ্বাসের ভিত্তিই বা কি, আর এর মূল্যই বা কতটুকু ? ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির কিছু শাখার অবলুপ্তি ঘটেছে। তার ফলে গ্রাহকরাই অসুবিধায় পড়েছেন। এবারের সংযুক্তিও স্বাভাবিক ভাবে বহু শাখাকে চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেবে। অপরদিকে উদ্বৃত্ত কর্মীদের এই মুহূর্তে যদি ছাঁটাই নাও করা হয়, তাহলেও বেশ কিছুদিন ঐ ব্যাঙ্কগুলিতে নতুন কর্মী নিয়োগ যে বন্ধ থাকবে তাও পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ফলে এই পদক্ষেপের সাথে ব্যাঙ্কের সাধারণ গ্রাহক বা ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা নেই।

শুধু তাই নয়, এত দিন গ্রাহকরা সুদের হার বা পরিষেবা মাশুল বিচার করে পছন্দ মতো ব্যাঙ্ক বেছে নেওয়ার যে সুযোগ পেতেন, তা সংকুচিত করা হল। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সংযুক্তির পর সেখানে জমা টাকার ওপর সুদের হার কমেছে, পাশাপাশি পরিষেবা মাশুলের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তার পরিমাণও বেড়েছে। সংযুক্তির পর অন্যান্য ব্যাঙ্কেও তেমন পরিণতিই স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী কথিত পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে দ্রুত পৌঁছাতেই বৃহৎ এবং আন্তর্জাতিক মানের কয়েকটি ব্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। এতে লাভ কার? দেশের সাধারণ মানুষের কোন মোক্ষ লাভটি এর দ্বারা সম্পন্ন হবে? দেখা যাচ্ছে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতেই দেশের বৃহৎ পুঁজির মালিকরা একেবারে দুই হাত তুলে একে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত। বোঝা যায় এর থেকে তারা বড়সড় লাভের আশা করছে। বাস্তবে ঘটনাও তাই। এদেশে ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ (দীর্ঘকাল শোধ না হওয়া ঋণ) দাঁড়িয়েছে ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। শুধু মাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতেই তা সরকারের অত্যন্ত রাখঢাক করা হিসাবেও ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই টাকার বেশিরভাগটাই পড়ে আছে এ দেশের বড় বড় পুঁজি মালিকদের ঘরে। তার সাথে বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, প্রধানমন্ত্রীর 'মেহুল ভাই'দের মতো লুঠেরাদের কারবারে ব্যাঙ্কের আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা উধাও হয়ে গেছে। বিজেপি সরকারের গত পাঁচ বছরের আমলে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয়েছে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৫৩ কোটি টাকা। শুধু ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এই জালিয়াতি ৭১ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আর্থিক বৃদ্ধি যতই কমুক ব্যাঙ্ক জালিয়াতি বেড়েছে ৭৩ শতাংশ (এনডিটিভি, ২৯ আগস্ট ২০১৯)। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির হাল খারাপ। এমনিতেই দেশের অর্থনীতিতে গভীর মন্দার লক্ষণ। হিসাবে অনেক কারচুপি করেও আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে নেমেছে বলে স্বীকার করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। শিল্প উৎপাদন তলানিতে বললে ভুল হবে, তার সূচক ছুটছে শূন্যের নিচের দিকে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নামতে নামতে এমন জায়গায় যে করপোরেট মালিকরাও বলছে, পাঁচটাকার বিস্কুট, কিংবা দু'টাকার শ্যাম্পুর পাতা কিনতেও লোকে ইতস্তত করছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বৃহৎ পুঁজি মালিকদের জন্য ব্যাঙ্ক-রূপী কামধেনুর ব্যবস্থা করে দিতেই এই ব্যবস্থা। যাতে দেশের অর্থনীতিতে যতই সংকট থাকুক আম্বানি, আদানি, টাটা, বিড়লাদের গায়ে তার এতটুকু আঁচ না পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়া কোষাগার থেকে ৭০ হাজার কোটি

আটের পাতায় দেখুন

নির্বাচনের পথে জনজীবনের সংকটের সমাধান হবে না

দুয়ের পাতার পর

পেলেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে যদি তার নৈতিক বল অটুট থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণি ঠিক এই জায়গাতেই প্রচণ্ড আঘাত হানছে, নৈতিক মেরুদণ্ডকে একেবারে ভেঙে দিচ্ছে সেই কারণেই। পুঁজিপতি শ্রেণি ঠিকই বুঝতে পারছে, যে তীব্র শোষণ তারা চালাচ্ছে এর ফলে যে শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, মানুষ তার প্রতিকার চাইবেই। ফলে চক্রান্তটা হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগঠন যাতে গড়ে উঠতে না পারে, প্রতিবাদ প্রতিরোধ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। এই জঘন্য মতলব থেকেই নৈতিকতার উপর এই আক্রমণ।

গরিব মানুষের ভোটে দাঁড়ানোর অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চলছে পুঁজিপতি শ্রেণির আক্রমণ। দেশে গণতন্ত্রের নামে যা চলছে তা পুঁজিপতি শ্রেণির জবরদস্তি, আড়াল থেকে পুঁজিপতি শ্রেণির নির্ভেজাল একনায়কত্ব। গণতন্ত্রের কোনও ভাল দিক আজ আর অবশিষ্ট নেই। একদিন গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা এসেছিল পাশ্চাত্যে রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তখন পুঁজিপতিরাই স্লোগান দিয়েছিল রাজার শাসন নয়, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন নয়, জনগণই জনগণকে শাসন করবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের শাসক নির্বাচিত করবে। নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকের সমান ভোটাধিকার থাকবে, সমান অধিকার থাকবে। জনসাধারণের ভোটে সরকার গঠিত হবে, ৫ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কোনও একটি সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলে জনসাধারণ ভোটের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং অন্য একটি দলের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নতুন সরকার গঠন করবে। ভোটের অধিকার, পছন্দের অধিকার এসব ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দিক। কিন্তু সেই গণতন্ত্র আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও কি আজ অবশিষ্ট আছে? গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনের চরিত্র আজ কী দাঁড়িয়েছে? নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পর্যবসিত করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে পুঁজিপতি শ্রেণির দলগুলি কী পরিমাণ টাকা খরচ করছে, তা আজ সকলেই জানে। জনগণের ভোট কিনতে গিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনও প্রার্থী যদি ১-২ কোটি টাকা খরচ করে তা হলে নির্বাচিত হওয়ার পর জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করে ৮-১০ কোটি টাকা বানাতে তার এক বছর সময়ও লাগে না। গণতন্ত্রের নামে নির্বাচন এখন শুধুমাত্র প্রতারণা। নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয় জাতপাত, ধর্ম-বর্ণের মধ্য দিয়ে, মারাত্মক বিভাজনবাদ, ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে, আর এর চূড়ান্ত পর্যায়ে, পুঁজিপতি শ্রেণির অঢেল টাকা এবং প্রচারের বন্যা বইয়ে।

শোষিত জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি 'ভারতবর্ষ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ' বলে দিনরাত প্রচার করছে আর এই 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে'র দেশে বেশির ভাগ মানুষ আজ না খেয়ে মরছে। আজকের এই গণতন্ত্রে জনগণের হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে। এই গণতন্ত্র তা হলে কার গণতন্ত্র, কোন জনগণের গণতন্ত্র? আজ গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত এই সমাজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, পুঁজিপতি শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় তাদেরই তাঁবেদার দলগুলো জনগণের ভোট কিনে নিয়ে সরকার বানিয়ে মন্ত্রী হয়ে জনসাধারণকে আরও তীব্রভাবে শোষণ করে চলেছে। প্রতিদিন জনসাধারণের সাথে মিথ্যাচার করছে, প্রতারণা করছে। অন্য দিকে জনসাধারণের অর্জিত সমস্ত মৌলিক অধিকার, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অধিকার, মিটিং-মিছিলের অধিকার, শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার অধিকার, এই সরকারগুলি আজ একটা একটা করে কেড়ে নিচ্ছে।

এই যে লোকসভার নির্বাচন হয়ে গেল, তাতেও তো পরিষ্কার দেখা গেল টাকা-পয়সা, মিথ্যাচার, ধূর্তামি, ভণ্ডামি, প্রতারণা, জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেওয়া— অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে। এই নির্বাচনে জেতার জন্য বিজেপি কী পরিমাণ টাকা খরচ করেছে তার সবটা প্রকাশ্যে না এলেও কিছু কিছু খবর পত্র-পত্রিকায় এসেছে। শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস ইত্যাদি সমস্ত বুর্জোয়া দল এমনকি বামপন্থী বলে যারা এখনও নিজেদের পরিচয় দেয় তারা সকলেই কর্পোরেট হাউস বা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছ থেকে অভাবনীয় পরিমাণ টাকা পেয়েছে এবং ভোট কেনার জন্যই এই টাকা খরচ হয়েছে। পুঁজিপতিরা যে এই অঢেল টাকা ঢালছে তা আসছে কোথা থেকে? আপনারা জানেন, গরিব মানুষকে শোষণ করেই পুঁজিপতিরা প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক হয়। এই তহবিল থেকেই তারা তাদের হয়ে যে দলগুলি নির্বাচন লড়ছে তাদেরকেই যথেচ্ছ টাকা দিচ্ছে। আপনারা দেখছেন, পুঁজিপতিরা মানুষের ভোটাধিকার, বিবেক সব কিছু কিনে নিতে এই টাকা খরচ করছে। ঘটনা থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসছে যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের যে একটি মাত্র অধিকার অবশিষ্ট ছিল— জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকার, পুঁজিপতিরা আজ সেটাও ছিনিয়ে নিচ্ছে। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, পুঁজিপতিদের গোলামরাই আজ নির্বাচনে জিতছে। এই অবস্থায় গরিব মানুষের প্রকৃত কোনও প্রতিনিধিই আজ আর নির্বাচনে জিততে পারছে না। নির্বাচনের নামে এমন ব্যবস্থাই সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চক্রান্ত আরও গভীর। আজ এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, গরিব মানুষের দল বা প্রতিনিধিকেআটকাতে জাত-পাত, টাকা-পয়সা কোনও কিছুই যদি কাজ না করে তা হলে এই কারণ, সেই কারণ দেখিয়ে, নানা অজুহাত সৃষ্টি করে গরিব মানুষের দলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারটাই ওরা কেড়ে নিতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার গঠন দূরে থাকুক লোকসভায়, বিধানসভায় গরিব মানুষের কোনও প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আজ আর থাকছে না। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই তথাকথিত নির্বাচনে এখন আর গণতন্ত্রের কিছুই থাকছে না। এই মৌলিক কারণেই এই বুর্জোয়া নির্বাচনের সাথে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। বিগত ৭০ বছরে কেন্দ্রে রাজ্যে যত নির্বাচন হয়েছে, যত সরকার পরিবর্তন হয়েছে, ধারা কিন্তু একটাই। ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগ গরিব আরও গরিব হয়েছেন।

নামধারী বামপন্থী দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলছে

পুঁজিবাদের এই শোষণ-অত্যাচারের ফলে দেশে সমস্ত দিক থেকে যে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে,

চারের পাতায় দেখুন

বামপন্থী রাজনীতির মহত্ত্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্যে

তিনের পাতার পর

সেই প্রেক্ষাপটে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে দেশে প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, প্রকৃত বামপন্থী ভাবধারার ভিত্তিতে জনজীবনের সমস্যাগুলিকে নিয়ে লাগাতার শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, এই সঠিক পথে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আজ আমাদের দল ছাড়া অন্য কোনও বামপন্থী দল নেই। সিপিএম, সিপিআই সহ তথাকথিত অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি বহুদিন আগেই এই পথ ছেড়ে বুর্জোয়া দলগুলির মতোই কেবলমাত্র ভোটের রাজনীতিই করছে। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরায় বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় বসে এরা বুর্জোয়া কায়দায় অন্যান্য পুঁজিবাদী দলগুলির মতো যেভাবে শাসন চালিয়েছে, যে ভাবে দমন-পীড়ন চালিয়েছে, জনগণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে ধ্বংস করেছে, যেভাবে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে পর্যন্ত পদদলিত করেছে, তার ফলে ওই সব রাজ্যে জনমত প্রচণ্ড ভাবে তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের আদর্শ এবং আবেদন বিশেষ করে এইসব রাজ্যের জনগণকে যে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত, তাদের এইসব মার্কসবাদ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে, সাময়িকভাবে হলেও তা বহুলাংশে হারিয়েছে।

আপনারা অবহিত আছেন ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ সেখানকার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী জাতীয় কংগ্রেসকে প্রায় নির্মূল করে তথাকথিত বামপন্থীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। আপনারা জানেন দীর্ঘ ৩৪ বছর তারা ক্ষমতায় আসীন ছিল। এই ৩৪ বছর সিপিএম সরকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে জনগণকে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা করেছে। তাদের চূড়ান্ত দমনমূলক কার্যকলাপ, চূড়ান্ত দুর্নীতি, অন্যায় শাসন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পাশবিক আক্রমণ— এইসব দেখে জনগণ কংগ্রেস প্রমুখ পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দলগুলির শাসন-শোষণের সঙ্গে এদের কোনও পার্থক্যই খুঁজে পাননি। এই অবস্থা জনগণ আর সহ্য করতে না পেরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ভিত্তি করে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং সেই সুযোগে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসেরই একটি দলছুট অংশ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় বসল। দৃশ্যতই সিপিএমের 'বামপন্থা' একটি প্রবল শক্তিশালী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিরই জন্ম দিল। এরই পথ বেয়ে পুঁজিবাদী তৃণমূলের চূড়ান্ত জনবিরোধী অপশাসনের সুযোগ নিয়ে এবং এটা শুনে আপনারা স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, সিপিএমেরও সহযোগিতা পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তৃণমূল থেকে আরও মারাত্মক দক্ষিণপন্থী শক্তি বিজেপি লোকসভার বিগত নির্বাচনে ৪২-এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে। আপনারা দেখেছেন ২০১৮-র ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে একই জিনিস হয়েছে। সিপিএমের একটানা ২৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সিপিএমের লোকজনকে টেনে নিয়ে আরএসএস-বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় বসেছে। কেরলে বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকে নিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত ফ্রন্ট এবং সিপিএম নেতৃত্বে ঠিক একই ধরনের বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া এবং আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিয়ে আরেকটি ফ্রন্ট প্রায় পালা করে ক্ষমতায় বসে এবং এই দুই ফ্রন্টের মধ্যেই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবদ্ধ থাকে এবং যেই জিতুক সম্পূর্ণ বুর্জোয়া কায়দায় সরকার পরিচালিত হয়। আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন, পুঁজিবাদকে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে কোনও ভাবে সংঘাতে না গিয়ে, তাদের স্বার্থে সরকার পরিচালনার মধ্যে বামপন্থার ছিটেফোঁটাও নেই। কারণ এটাই দক্ষিণপন্থা, এটাই বুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রাজনীতি। অন্য দিকে বামপন্থা এবং বামপন্থী রাজনীতির মর্মবস্তু নিহিত রয়েছে শোষিত জনসাধারণের স্বার্থে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, দক্ষিণপন্থা আরও মারাত্মক দক্ষিণপন্থার জন্ম দেবে, সে কখনও বামপন্থার জন্ম দিতে পারে না। অপরদিকে প্রকৃত বামপন্থা আরও উন্নততর বামপন্থার জন্ম দেবে। সে কখনও দক্ষিণপন্থার জন্ম দিতে পারে না। এই ধারায় সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল বিপ্লবী আন্দোলনের দিকেই শোষিত জনসাধারণকে পরিচালনা করবে। অন্যান্য দিক থেকে সিপিএম-সিপিআই এর সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও উপায় থাকলেও, এদিক থেকে বিচার করলেও এই সত্যই ফুটে উঠছে— জেনে হোক, না জেনে হোক এরা দক্ষিণপন্থার রাজনীতিই করছেন, পুঁজিপতিদের পক্ষ অবলম্বন করেই রাজনীতি করছেন।

৫ আগস্ট গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশের একাংশ

আপনারা অনেকেই জানেন, ১৯২০ সালে অবিভক্ত সিপিআই গড়ে উঠেছিল। জন্মের পর এরা আজকের মতো গণআন্দোলন বর্জিত বুর্জোয়া পরিষদীয় রাজনীতির চর্চা করেনি। সংস্কারপন্থী ভাবে হলেও শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন করেছে। সেদিনকার এইসব আন্দোলনমুখী কার্যকলাপের ফলে তাদের নেতা-কর্মীরা লাঠি-গুলি, কারাবাসের মুখে পড়েছেন। এই সবই সত্য। এগুলোকে যথাযথ ভাবে স্বীকার করে নিয়েও প্রিয় নেতা এবং মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৫ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, মার্কসবাদসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করে একটি প্রকৃত সর্বহারার বিপ্লবী দল, একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। সিপিআই দল সেই ভাবে গড়ে উঠেনি। মধ্যবিত্ত, পেটিবুর্জোয়া সুলভ মনন মানসিকতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিবোধ, ব্যক্তিগত মানসিকতা থেকে উদ্ভূত পরিবার সংক্রান্ত ধারণা, সর্বোপরি বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ— এগুলো থেকে মুক্ত হয়ে ডি ক্লাসড হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম তারা শুরু করতে পারেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার আরেকটি লেনিনীয় পূর্বশর্ত— সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব— দি কারেক্ট স্ট্র্যাটেজিকাল লাইন— রাষ্ট্রের সঠিক চরিত্র নির্ধারণ— এই ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র যে পুঁজিপতি শ্রেণির রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল তা ধরতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। আপনারা ভাববার চেষ্টা করুন, সেদিনকার ওই অবস্থায় দেশে এবং বিদেশে যখন উচ্চকণ্ঠে তাদের গুণগান হচ্ছে, সেই অবস্থাতেও কমরেড শিবদাস ঘোষ দৃঢ়তার সাথে এই বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, এই অবস্থায় বসে থাকার উপায় নেই, কালবিলম্ব না করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সঠিক শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল, প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করতে হবে। বলা বাহুল্য তখন তিনি নিতান্তই একা। কিন্তু এটা তাঁর পথ আটকাতে পারেনি। আপনারা জানেন, সেই পথেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্ভব। অবিভক্ত সিপিআই ছাড়া মার্কসবাদের নামে অবশ্য কয়েকটি দল সেই সময় দেশে ছিল। মার্কসবাদী পণ্ডিত ও বিদ্বান বলে পরিচিত কিছু ব্যক্তিও সেই সময় দেশে ছিলেন। এম এন রায়, যিনি লেনিনের সহযোগী হিসাবেও কাজ করেছিলেন, তিনিও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই অবিভক্ত সিপিআই এবং সেই সময়ের মার্কসবাদী আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে এই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পারেননি। এস ইউ সি আই (সি)-র জন্ম এবং বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ধরা পড়ছে কী ধরনের গভীর প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তাঁর শিক্ষার আলোকেই প্রতিদিন সাধারণ শোষিত জনসাধারণকে সংগ্রামে সংগঠিত করে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি।

আজ তো ওদের সংগ্রামবিমুখ মানসিকতা, পুঁজিবাদী দলগুলির সাথে মিলেমিশে থাকা, পুঁজিপতি শ্রেণির ওদের প্রতি বোঝাপড়ার মনোভাব শুধু আমাদের কাছে নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাদের কাছেও ধরা পড়ছে। এই ঘটনায় তাদের ক্ষোভ এতটাই যে বহু মানুষ আমাদের প্রতি সমর্থন এবং সহমর্মিতা জানিয়েও ক্ষুব্ধ মন নিয়ে আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে জানতে চান, আমরা সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে আছি কি না। ওদের নির্বাচনী ফলাফল যদি সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তা হলেও এই সত্যটাই উঠে আসবে— ওরা দ্রুত জনগণের সমর্থন হারাচ্ছে। আরএসএস-বিজেপির দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদ যখন প্রচণ্ডভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং তাকে মোকাবিলা করার জন্য যখন বামগণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেই সময় আমাদের কাছে ওদের এই নিদারুণ অবস্থা, নিশ্চয়ই সুখকর নয়। কিন্তু আমরা কিংবা জনগণ কষ্ট পেলে ওদের কী এসে যায়! পুঁজিবাদের সঙ্গে ওদের বোঝাপড়া এদিক ওদিক হবার নয়।

আরএসএস-বিজেপির বাড়বাড়ন্তের পিছনে কংগ্রেসের ভূমিকা আছে

ওদের এই সর্বনাশা রাজনীতির আরও কয়েকটি মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কেও আমি আপনাদের অবহিত করতে চাই। আপনার দেখছেন, সিপিএম আজ গণআন্দোলনের পথ পরিহার করে ক্ষমতার লোভে পরিষদীয় রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। দুই-একটা আসন জেতার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ সাজিয়ে কংগ্রেসের সাথে নির্বাচনী আঁতাঁত গড়ে তুলছে— এটাই হচ্ছে ওদের ঘোষিত সাধারণ লাইন। সকলেই জানেন কংগ্রেস পুঁজিপতি শ্রেণির অতি বিশ্বস্ত একটা দল। আজ সে ক্ষমতায় না থাকতে পারে, কিন্তু এই দলটি ৫৩/৫৪ বছর ক্ষমতায় থেকে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সংহত করার কাজই করেছে। ভোটের স্বার্থে সেই কংগ্রেসকে এখন সিপিএম ধর্মনিরপেক্ষ সাজিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভবের তো একটা ইতিহাস আছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিনে পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে যখন গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ ঘটছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটছিল, সেই সময়ই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছে। রাজতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের ওপর চার্চ তথা ধর্মের প্রাধান্য ছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল চার্চ বা ধর্মের অধীন। তার বিরুদ্ধে মানুষ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে। এই পথে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ধারণার জন্ম হয়েছে যে ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়। তার সাথে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার পরিচালনার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আরও উন্নত স্তরে এই ধারণারও জন্ম হয়েছিল যে ধর্মনিরপেক্ষতার যথার্থ অর্থ হচ্ছে নন রেকগনিশন অফ এনি সুপারন্যাচারাল এনটিটি (যে কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা)। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে, সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের দিনে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উদ্ভব হয়নি, তাকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামের পথেই এই ধারণা গড়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের পথেই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়েছে। সেদিন তার প্রয়োজন ছিল ঐতিহাসিক। সেদিন বিকাশমান পুঁজিবাদ একদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে, অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভেদাভেদ, সর্বপ্রকার পৃথকতাবাদ, বিভাজনবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা— এগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লড়াই করেছে। কিন্তু আজ তো পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণু যুগ। আজ তো বিপ্লবের ভয়ে ভীত পুঁজিবাদ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারই সকল সৃষ্টিকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। তারই সৃষ্ট সকল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কবর দিচ্ছে ও যত প্রকারে পারা যায় জনগণকে জাত-পাত-ভাষা-ধর্ম-বর্ণের নামে বিভক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। উন্নত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষতার যে উচ্চ আদর্শ, তাকেও তারা প্রকাশ্যেই পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় পুঁজিবাদের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে কোনও একটি পুঁজিপতি শ্রেণির দলকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ বলি কীভাবে? মহান লেনিন বারবার স্মরণ করিয়েছেন, গণতন্ত্রের ধারণা সুপ্রা ক্লাস (শ্রেণি ঊর্ধ্ব) নয়, নিশ্চিত রূপে এটারও শ্রেণি চরিত্র রয়েছে। একদিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপরদিকে জনসংখ্যার ৯৫ ভাগ শোষিত জনসাধারণের গণতন্ত্র— সর্বহারা গণতন্ত্র। এই অর্থেই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণু এই যুগে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের দল ও সরকারগুলির মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা— এর কোনওটাই আজ আর নেই। বিপ্লবের ভয়ে ভীত পুঁজিবাদ আজ দৈত্য হয়ে উঠছে। নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সরকার বিরোধী বলেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

এনআরসি-র নামে আসামে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে

দেশ জুড়ে বিক্ষোভ, মিছিল, ধরনা, জনসভা

এনআরসি'র নামে আসামের ১৯ লক্ষাধিক মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত উগ্রপ্রাদেশিকতাবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির নির্দেশে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) ৫ সেপ্টেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করে। এদিন আসামে করিমগঞ্জ জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবি ওঠে, বহু বছর ধরে আসামে বসবাসকারী ১৯ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, উপস্থিত জনসাধারণের সম্মুখে দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণাংশু ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি সরকার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই এনআরসি প্রকাশ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বাদ যাওয়া নাগরিকদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দু হওয়ায় আসাম সরকারের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এনআরসি-র কোঅর্ডিনেটর প্রতীক হাজেলার উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে সরকারের দায় অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে আরএসএস-বিজেপি সরকার একশো আশি ডিগ্রি ডিগবাজি খেয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়িয়ে এনআরসি বাতিলের আওয়াজ তুলছে। শ্রমজীবী মানুষকে ভাগ করার অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এনআরসি প্রস্তুত করার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পরিমল চক্রবর্তী, তুষার দাস, বিষ্ণুপদ দত্ত, রঞ্জিত চন্দ, পিকলু দাস, নন্দন কুমার নাথ, সুজিত কুমার পাল, সঞ্চিতা শুক্ল প্রমুখ।

করিমগঞ্জ, আসাম

কলকাতা

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

আহমেদাবাদ

ত্রিপুরা

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

দিল্লি রাজ্য যুব সম্মেলন

বেকারি, মাদকাসক্তি, অশ্লীলতা এবং মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২৫ আগস্ট ত্রিনগরে এ আই ডি ওয়াই ও-র দিল্লি রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড প্রকাশ দেবী। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বেকার জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড জুবের রব্বানি। প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়েক। তিনি বলেন, সরকারের মারাত্মক কর্মসংকোচন এবং মাদকদ্রব্যের ঢালাও প্রসার নীতির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মেলন থেকে প্রভাস কুমারকে সভাপতি, ইন্দ্রদেব সিং ও রিতু অসওয়ালকে সহ সভাপতি এবং অমরজিৎ কুমারকে সেক্রেটারি ও মনীশ কুমারকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৪ জনের রাজ্য কমিটি এবং ১৮ কাউন্সিল গঠিত হয়।

এআইএমএসএস-এর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন

২৯-৩০ আগস্ট অনন্তপুরে অনুষ্ঠিত হল অন্ধ্রপ্রদেশ এর দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা সম্মেলন। ২৯ আগস্ট কৃষ্ণকলা মন্দিরে প্রকাশ্য সমাবেশে তিন শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধন করেন মানবাধিকার ফোরামের রাজ্য নেতা এ চন্দ্রশেখর। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড মিনি কে ফিলিপ। অনন্তপুর, কুর্নুল, চিতোর, নেলোর, গুন্টুর প্রভৃতি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কমরেড জি ললিতাকে সভাপতি, কমরেড এম তেজবতীকে সম্পাদক করে ২৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

নির্যাতিতা নারীদের পাশে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি

২৯ আগস্ট বহরমপুরে ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত নারীর আইনি সুরক্ষার দাবি তুলল রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি। জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পর রবীন্দ্র সদনে হয় আলোচনা সভা। তিনজন নির্যাতিতা ও সাহসিনী নারীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আলোচনা করেন প্রাক্তন বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত, সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য, শিক্ষাবিদ এস এম জাকি, প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া নাগ, রোকেয়া গবেষক মানস জানা প্রমুখ। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। বহু নির্যাতিতা নারী, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সুজাতা দে বসু, কার্যকরী সভাপতি ডাক্তার আলি হাসান, সম্পাদক খাদিজা বানুও বক্তব্য রাখেন।

বিজেপির প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে পরাস্ত করতে পারে একমাত্র বিপ্লবী রাজনীতিই

চারের পাতার পর

কোনও একটি পুঁজিবাদী দল ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক-বাহক হতে পারে না। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য দেখুন, মার্কসবাদের নাম নিয়ে চলা সিপিএম চূড়ান্ত অসত্য এবং অ-মার্কসীয় তত্ত্ব আওড়াচ্ছে এবং শোষিত জনসাধারণের মনে পুঁজিপতি শ্রেণির অতি বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস সম্পর্কে মারাত্মক মোহের জন্ম দিচ্ছে।

কংগ্রেসের ৫৩/৫৪ বছরের শাসনকালেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর জঘন্য আক্রমণ এবং নির্বিচারে হত্যার খবর কে না জানে। আরএসএস-বিজেপির মতো জঘন্য সাম্প্রদায়িক শক্তি যে আজকের অবস্থানে এসেছে তাতে কংগ্রেসের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। নিঃসন্দেহে বিজেপি পুঁজিপতি শ্রেণিরই আরেকটি অতি বিশ্বস্ত দল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এরা হালে পানি পায়নি। স্বাধীনতার পরও প্রথম দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের রেশ কিছুটা থাকায় আরএসএস তেমন পাত্তা পায়নি। যে সাভারকরকে আজকে বীর হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনে জনমনে তিনি কোনও জায়গাই করতে পারেননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে যোগসাজশ করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তিনি। এমনকি ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখতে চেয়েছেন তিনি। স্বাধীনতার পর সেই আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ এবং বিজেপিকে প্রশ্রয় দিয়েছে কংগ্রেস। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের দিক থেকে কোনও বাধার সম্মুখীন না হয়ে এরা দিনের পর দিন মুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে, তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করেছে, বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম জনসাধারণের ওপর আক্রমণ করেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েছে, নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। কিন্তু কাউকে কংগ্রেস সরকার শাস্তি দিয়েছে এরকম তো দেখা যায়নি। মেহনতি জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস সরকার এবং শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় আরএসএস-বিজেপি আজকের এই অবস্থায় এসেছে। কংগ্রেস, বিজেপি দুটোই পুঁজিপতি শ্রেণির দল। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

কয়েকদিন আগে কর্ণাটকের রাজনৈতিক ঘটনাও নিশ্চয় আপনাদের চোখে পড়েছে। কংগ্রেস এমএলএ-রা ব্যাপক সংখ্যায় বিজেপিতে যোগ দিয়ে কংগ্রেস ও জনতা (এস) সরকারের পতন ঘটিয়েছে এবং বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এই কংগ্রেস থেকে বিজেপি এবং বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যাওয়া আদৌ নতুন কোনও ঘটনা নয়। এটা হরবখতই হচ্ছে। এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তা হলে আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আদর্শগত সংগ্রাম কোথায়? আজকে সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প আরএসএস-বিজেপি সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা এবং সংগ্রাম কোথায়? হিন্দু ধর্ম, হিন্দুত্বের কথা বলে আরএসএস-বিজেপি কী ধরনের জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শংকরাচার্য, চৈতন্য, শংকরদেব এবং প্রাচীন দিনের আরও অনেক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক। তাঁদের শিক্ষায় তো মুসলিম বিদ্বেষ বা অন্য ধর্মকে হেয় জ্ঞান করার কথা কোথাও নেই। এঁরা তো সব ধর্ম সমান, যত মত তত পথের কথার উপরই জোর দিয়েছেন। এই দিকগুলি নিয়ে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে দীর্ঘ আলোচনা এবং আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে এই সত্যই তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে যে আরএসএস-বিজেপির কথা এবং কাজের মধ্যে চূড়ান্ত মুসলিম বিদ্বেষ কাজ করছে— ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে। হিন্দু ধর্মের মহত্ত্বের কোনও দিকই ফুটে উঠছে না। ভারতে বসবাসকারী ১৫/১৬ কোটি মুসলিম জনগণ কী খাবেন কী পরবেন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি স্টিম রোলার চালানো হয়, যদি তাদের প্রকাশ্যে হিন্দু হয়ে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয় তা হলে কেবল যে তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তাই নয়, এই পথে তো তাদের দাস বানানোই হয়। এটা তো ফ্যাসিবাদ, এটা তো হিটলারের নাৎসিবাদ! এই কাজটা যদি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর করা হয় তা হলে আরএসএস-বিজেপি নেতারা কী বলবেন? আমরা মনে করি এইসব দিকগুলি নিয়ে, এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে বিশদ আলাপ আলোচনা, মত বিনিময় খুবই জরুরি। দেশের জনসাধারণের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা রুখে দাঁড়ান, পরিস্থিতি সামলান, চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে দেশকে বাঁচান। একই সাথে এই কথাটাও আপনাদের বুঝতে অনুরোধ করব, পুঁজিপতি শ্রেণিই আজ ধর্মকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। আজ ধর্ম তাদের একটা বড় আশ্রয়স্থল। মুখ্যত তাদের স্বার্থেই সারা দেশে এই নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে আরএসএস-বিজেপি। তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ, মুসলিম মানুষ দেখলেই ঘৃণা— এমনই একটি অবস্থা সারা দেশে জন্ম দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। এই বিদ্বেষে দেশের আকাশ বাতাস বিষিয়ে উঠছে। মুসলিম বিদ্বেষকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের ইতিহাসও বিকৃত করা হচ্ছে। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের দিনে বাইরে থেকে যে মুসলিম রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিল, সেটা ছিল সেই সময়কার সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই ঘটনাগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা না করে এরা এই ঘটনাগুলোকে মুসলিম বিদ্বেষ গড়ে তুলতে কাজে লাগাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে দিন-রাত এরা অবিরাম মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করছে। উপযুক্ত সত্য প্রচারের অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরএসএস-বিজেপির চিন্তা ভাবনার প্রভাব পড়ছে। ফলে আরএসএস-বিজেপি শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক শক্তিই নয়, এটা হচ্ছে একই সঙ্গে অতি প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী একটা ভাবধারা।

প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতা রোখার একমাত্র হাতিয়ার মার্কসবাদ

তা হলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে মোকাবিলা করার পথ কী? কেবলমাত্র ভোটের মাধ্যমে একটা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে মোকাবিলা করা যায় না। ভোটে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়েছে, তার ফলে নির্বাচনে বিজেপি কখনও কখনও হেরেছে। কিন্তু তার দ্বারা আরএসএস-বিজেপির সাম্প্রদায়িকতা কতটা কমেছে, কতটা দূর করা সম্ভব হয়েছে? কোনও প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়ে এরা তো দিন দিন আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করছে। ফলে কংগ্রেসকে কিংবা এই ধরনের আরও কিছু বুর্জোয়া দলকে ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দিয়ে ভোটের আগে কোনও প্রকারে জোটবদ্ধ করে একসঙ্গে নির্বাচনে লড়ে আরএসএস-বিজেপির চিন্তা-ভাবনাকে কতটা নির্মূল করা যাবে, এটা দেশের চিন্তাশীল মানুষকে গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে। এই তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আমরা বারে বারে তা নির্ভুল ভাবে দেখিয়ে আসছি। এই ভ্রান্ত পথে গিয়ে সিপিএমের নেতারা কেবল নিজের দলের সর্বনাশ করেননি, তাঁরা বামপন্থারও সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। আমরা বার বার বলছি আরএসএস-বিজেপির এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে রুখতে হলে, জনসাধারণের মধ্যে আরও একটি উন্নত ভাবধারা, উন্নত একটি আদর্শের জন্ম দিয়েই তা সম্ভব। অন্য কোনও সহজ, সরল, শর্টকাটের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব নয়।

আজকের দিনে সেই ভাবধারা হচ্ছে মার্কসবাদী ভাবধারা, মার্কসবাদ। এই ভাবধারার ভিত্তিতে জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে সকল শোষিত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে— 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'— ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কসের সেই আহ্বানের ভিত্তিতে তাদের সামনে শোষণমুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যকে তুলে ধরতে হবে। তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যগুলি পূরণের দাবিতে, উন্নত নীতি নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শক্তিশালী গণআন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। মহান শিক্ষক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন, সকল শোষিত জনসাধারণের বাঁচার এই আন্দোলনগুলো গড়ে তুলতে এবং পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত শ্রেণিচেতনার চর্চা করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বুর্জোয়া দলগুলির চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে শোষিত জনসাধারণকে মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেছেন, এর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। এই কারণেই তিনি বলেছেন, বিপ্লবী আন্দোলনের দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান সময়টা হচ্ছে ফেজ অফ ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অর্থাৎ গণআন্দোলনের পর্যায়। এই পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই বিপ্লবী কর্তব্য।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, শুধু হিন্দুত্বের নামে সাম্প্রদায়িকতা নয়, একই সাথে ক্ষমতায় বসে বিজেপি মেহনতি জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য এটা সেটা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিও করছে। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলন সেই ব্যাপকতা নিয়ে না থাকার ফলে জনমনে এদের সম্পর্কে বেশ কিছুটা মোহও সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় আরএসএস-বিজেপিকে শুধু ভোটের মাধ্যমে হারানোও সহজ কাজ হবে না। বিশেষ করে এই কারণে যে তার পিছনে বুর্জোয়া শ্রেণির সর্বাত্মক সমর্থন কাজ করছে এবং তাদের হাতেই রয়েছে টাকা পয়সা, আইন কানুন এক কথায় গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সর্বোপরি একটি অতি শক্তিশালী প্রচার যন্ত্র। এইসব কারণেই আমরা বলছি, আজকের এই অবস্থায় সঠিক রণনীতি হচ্ছে, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি প্রতিকারের দাবিতে শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং একই সাথে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আরএসএস-বিজেপির পুঁজিবাদী চরিত্র এবং তাদের সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরামহীন ভাবে জনগণকে সচেতন করা। তাদের শ্রেণিসচেতন করা। সংগ্রামের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই দুই অভিমুখকে সামনে রেখেই এই ঐতিহাসিক সংগ্রামকে পরিচালনা করতে হবে। আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন জনগণের অন্যান্য জরুরি দাবি আদায়ের ক্ষেত্রেও যেমন, এই অতি সংকটজনক পরিস্থিতিতেও আমরা ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলগুলি শুধু ভোটের মাধ্যমে আরএসএস-বিজেপিকে পরাস্ত করার কথা বলে আসল লড়াই থেকে পালাচ্ছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তেমনি আরএসএস-বিজেপিকে রোখার প্রশ্নেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এইসব পুঁজিবাদী দলগুলির মধ্যে আপাতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন আসলে তারা সকলে মিলে একটি পক্ষ হিসাবে কাজ করছে এবং তার বিপরীতে আমরা একক ভাবে একটা পক্ষ হিসাবে কাজ করছি। সম্পূর্ণ সচেতন বিপ্লবী দল হিসাবে, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী দল হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণির সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এই অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের উপরেই বর্তেছে। এবং প্রতিদিনের ক্লাস ও মাস স্ট্রাগল (শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম) গড়ে তোলার ও পরিচালনা করার যে দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হয় তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এই আন্দোলনকে গণ্য করতে হবে। এই সঠিক লাইনে এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম এখনই দেশের সর্বত্র আমাদের জোরদার করতে হবে। ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক, জনগণকে পাশে পেলে আন্দোলন এগিয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি সামর্থ্যের প্রেক্ষিতে আমাদেরই নেতৃত্বে সারা দেশে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা কতটা বাস্তব, এ নিয়ে জনগণের মনে, এমনকি আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মনেও প্রশ্ন জাগতে পারে। আমার বক্তব্য, অন্য যে কোনও ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণের প্রশ্নেও তো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দায়িত্ব গ্রহণ, কারণ এটাই প্রথম পদক্ষেপ। এর তো কোনও বিকল্প নেই। আপাতদৃষ্টিতে যতই অসম্ভব মনে হোক, দেশে দেশে মার্কসবাদের ভিত্তিতে বিপ্লব সংগঠিত করা এবং এরই অপরিহার্য প্রয়োজনে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে তো একই দৃষ্টিভঙ্গি! শক্তি কোথায়— এই বলে কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে কালবিলম্ব করা চলে না। সঠিক লাইনে চলার পথেই তো শক্তি সঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ইতিহাসও বলছে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে যে দেশেই এই কাজ শুরু হয়েছে সেখানেই বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে।

আজ তাঁকে স্মরণ করার এই ঐতিহাসিক দিনে আবার আমি স্মরণ করাব— আমাদের দল গড়ে ওঠার ইতিহাসও একই কথা প্রমাণ করে। হাতে গোনা যে কয়েকজন কর্মী নিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দল গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন, সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তোলার যে অপরিহার্য পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, যে অভ্রান্ত স্ট্র্যাটেজিকাল লাইন তিনি তুলে ধরেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়েও সংগ্রাম শুরু করার মুহূর্তে দু-একজন অতি নিষ্ঠাবান সদস্য— শক্তির সীমাবদ্ধতার দিকটি দেখিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, এখনই এই কাজটি হাতে নেওয়া কতটা সমীচীন। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রথমেই ঠিক হওয়া দরকার শক্তি আমাদের যত কমই হোক, আমরা কি গোলামি করতে পারি, সত্য বুঝেও আমরা কি চোখবুজে

সাতের পাতায় দেখুন

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষ্যে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৯)

নারীশিক্ষা ও বিদ্যাসাগর

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ বন্ধ করার কঠিন আন্দোলনের পাশাপাশি নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি বিরল ও ঐতিহাসিক লড়াই করেছিলেন।

উনিশ শতকের শুরুতেই এদেশের রামমোহন-সহ আরও কয়েকজন নারীশিক্ষার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। কলকাতায় প্রথম মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৯ সালে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামক এক খ্রিস্টান সমিতির উদ্যোগে। সেগুলি ছিল ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল। মেয়েদের মধ্যে বাংলা শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮২২ সালে তাঁরা একটি বই প্রকাশ করেন, 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'। যদিও এসবের তেমন কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। ১৮২৪ সালে গঠিত 'লেডিজ সোসাইটি'র উদ্যোগে আরও কয়েকটি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২৫ সালে গঠিত 'লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন' নামে আর একটি সংস্থা কলকাতার মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং কিছু মুসলিম পুরুষ এমনকি দু-এক জন মুসলিম মহিলাও এই কাজে তাঁদের ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে হিন্দু-মুসলিম কোনও অংশেরই সাধারণ নারীসমাজে এই উদ্যোগগুলির প্রভাব পড়েনি। এমনিতেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যাপারে ভারতীয় সমাজ ছিল মারাত্মক রক্ষণশীল। তার উপর, এই স্কুলগুলি সম্পর্কে জনমনে ধারণা ছিল, এদের আসল উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং এই ধারণার কিছু বাস্তব ভিত্তিও ছিল।

সে-সময় বাংলার বিভিন্ন জেলায় ধনী এবং কিছুটা উদারমনা ব্যক্তিরাও মহিলা বিদ্যালয় করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় কোনও উদ্যোগই ফলপ্রসু হচ্ছিল না। ইতিহাসের এই পর্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে এলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রাজা তো ননই, ধনীও নন। কেবল তাঁর দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের, বিশেষত নারীদের দুরবস্থায় বেদনাহত এক মানুষ। ধর্ম-বর্ণ কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে ন্যুব্জকুব্জ দেশবাসীর ব্যথা তাঁকে কাঁদিয়েছে। অশিক্ষার সেই নিকষ তমসাকে ছিন্ন করে দেশবাসীকে

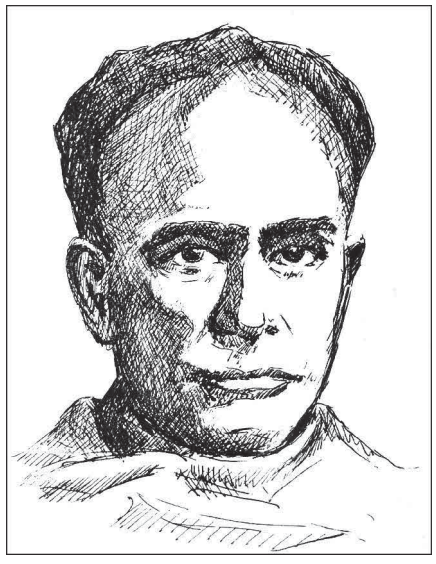

আলো দেখাতে বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে হাত দিলেন এবং নারী-পুরুষ সহ সমাজের সকলের জন্য শিক্ষার লড়াই শুরু করলেন।

এই সময়ই বেথুন সাহেবের উদ্যোগে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'বেথুন স্কুল') প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু শুধু স্কুল হলে কী হবে, মেয়েরা কি পড়তে আসবে? বাড়ি থেকে তাদের ছাড়বে? স্কুল চালনার ব্যাপারে বেথুনসাহেব বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাইলেন। তৎকালীন সমাজের প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এবং অতীতের স্কুলগুলির করুণ ইতিহাস জেনেও বিদ্যাসাগর সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর একটাই লক্ষ্য, নারীসমাজ তথা দেশের মানুষকে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন গোঁড়ামির অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সভ্যতার আলোয় আনতেই হবে।

বিদ্যাসাগর নিজে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করলেন। তাদের বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্যদের ধৈর্য ধরে বোঝাতে শুরু করলেন। কারও বাড়িতে অপমানিত হলেন, কোথাও প্রত্যাখ্যাত হলেন, কোথাও বা একটু ক্ষীণ আশ্বাস পেলেন। যেখানে যতটুকু যা পেলেন তাকেই আঁকড়ে ধরলেন তিনি। বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা অনুমোদন করালেন। শুরু হল স্কুল। স্বঘোষিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা তেড়েফুঁড়ে উঠলেন। বললেন, 'শাস্ত্রে মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় নিষেধ আছে। বই পড়লে মেয়েরা বিধবা হবে। সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।' তাঁরা বলতে শুরু করলেন, 'মেয়েদের কখনই ঘরের বাইরে বেরতে দেওয়া যায় না। তাদের স্বাধীনতা নেওয়া মানে সমাজের সর্বনাশ করা। মেয়েদের অবশ্যই শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন রাখতে হবে।' এইভাবে গোঁড়া পণ্ডিতদের দাপটে নারীশিক্ষার আয়োজন ফের একবার অতীতের কলঙ্কিত অধ্যায়ের মুখোমুখি হতে বসল।

তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আক্রমণের সামনে রুখে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শাস্ত্র কিছু আমিও পড়েছি। মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কথা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে দেখান।' পণ্ডিতের দল থমকে গেল, কিছুই দেখাতে পারল না। কিন্তু থমকেও তাঁরা থেমে গেল না। সমাজে তাঁদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল সাংঘাতিক। তাঁরা সর্বত্র নারীশিক্ষাকে শাস্ত্রবিরোধী বলে প্রচার করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর সারাদিন স্কুল-কলেজ সামলে রাত জেগে পড়তে লাগলেন যাবতীয় শাস্ত্রীয় পুঁথিপত্র। যেভাবেই হোক অপপ্রচারকারীদের মুখ বন্ধ করতে হবে। ওদের অস্ত্রেই ওদের ঘায়েল করতে না পারলে যে চলবে না, এ-তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। অবশেষে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সমর্থনে শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করলেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' এবং স্কুলের গাড়ির গায়ে বড় বড় হরফে সেই শাস্ত্রবচন লিখিয়ে দিলেন। শুধু প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতের দলই নয়, বেথুন স্কুল শুরু হওয়ার পর নারীশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার ডিগ্রিধারী দেশীয় একদল ব্যক্তিও। তাঁদেরও সমাজে, বিশেষত শিক্ষিতমহলে যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। এই ধরনের বিরোধীদের সঙ্গেও মতামতের তীব্র লড়াই হয়েছে বিদ্যাসাগরের।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের অভূতপূর্ব এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হল। ১৮৫৭ সালের শুরু থেকেই গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় তৈরির কাজে হাত দিলেন তিনি। মে মাসে বর্ধমানের জৌগ্রামে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে ছেলেদের জন্য তিনি বেশ কিছু মডেল স্কুল করেছেন। সেভাবেই মেয়েদের জন্যও মডেল স্কুল নির্মাণেরও উদ্যোগ নিলেন। ছ-সাত মাসের মধ্যে হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, মেদিনীপুরে মোট ৩৫টি বালিকাবিদ্যালয় তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং আরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু এই সময়েই সংঘটিত হয় সিপাহিবিদ্রোহ। এই ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম সিপাহিদের ঐক্য দেখে ইংরেজ শাসকরা ভীত হয়ে পড়ে এবং তাদের শাসননীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায় ভারতশাসন। শিক্ষা প্রসারের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জেলায় জেলায় স্কুল করার জন্য আর্থিক সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিল তা থেকে তারা সরে দাঁড়ায়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর পড়ে গেলেন মহা বিপদে। তিনি সরকারকে চিঠি দিয়ে এই জটিল সমস্যার কথা বিশদে জানালেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা নির্বিকার থাকল। এই সময়েই ব্রিটিশ শিক্ষাবিভাগের নিয়ামকদের সাথে নীতিগত বিরোধের কারণে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ সহ সমস্ত সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তাঁর মাইনেপত্র সব বন্ধ হয়ে গেল। তার ওপর এতগুলি স্কুল সরকারের সাহায্য ছাড়া কোনও ভাবেই চলতে পারে না। অন্য যে-কেউ হলে সম্ভবত এই কারণটা দেখিয়ে স্কুলগুলি বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণকে জ্ঞানে-চেতনায় সোজা করে দাঁড় করাবার জন্য যে স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটির অকল্পনীয় সংগ্রামের কথা আমরা একটু-আধটু জানছি, তাঁর নাম বিদ্যাসাগর। স্বদেশের হিতসাধনে যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতে যিনি নিজের সর্বস্ব নিয়ে সদা প্রস্তুত। সরকারি সাহায্য বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গড়ে তুললেন 'নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার'। সর্বাগ্রে নিজের সর্বস্ব দিলেন। তারপর আগ্রহী প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বোঝালেন এই বিশেষ প্রয়োজনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য। সাধারণের শিক্ষার জন্য এমন ঐতিহাসিক গণউদ্যোগের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরই।

প্রবল প্রতিকূলতার মোকাবিলাতে বিদ্যাসাগরকে নানা ভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পরিস্থিতিকে খুব নিখুঁত ভাবে বিচার করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। কোনও কারণে যাতে আরব্ধ কার্যক্রম ব্যাহত না হয়, সেদিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছে। মূল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করার জন্য কখনও এক পা এগিয়েছেন আবার কখনও এক পা পিছিয়েছেন। কেউ কেউ সেজন্য তাঁকে ভুল বুঝেছেন, তাঁর উপর অভিমান করেছেন, এমনকি তাঁকে দোষারোপও করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমস্ত কিছুই অটল পর্বতের মতো সহ্য করেছেন এবং অতলান্ত ধৈর্যের সাথে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ গড়ে তোলার কাজ করে গেছেন।

(চলবে)

স্মরণ দিবসে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ছয়ের পাতার পর

থাকতে পারি? আজ এটা ইতিহাস, সত্যকে অবলম্বন করে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের এই সংগ্রাম কত দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল। সঠিক তত্ত্ব এবং সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের অপরিহার্যতার কথা কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার স্মরণ করিয়েছেন। আপনারা জেনেছেন, প্রতিনিয়ত এই বিপ্লবী তত্ত্বের উন্নততর উপলব্ধি ঘটিয়ে এবং পদ্ধতিকে প্রতিনিয়ত সঠিক ভাবে অনুসরণ করে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৬ এই ২৮ বছরের মধ্যে শূন্য থেকে শুরু করে সিপিআই-সিপিএমের কমিউনিজমের তকমাকে চুরমার করে দলকে তিনি কোন জায়গায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন! তাঁর মৃত্যুর পর এই ৪৩ বছরে এই দল তাঁর মতো অতি উচ্চ এক মহান নেতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতের প্রতিটি রাজ্যে একটি বিপ্লবী দল হিসাবে জনগণের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার সঠিকতা প্রতিপন্ন করেই। এই প্রসঙ্গে আরও একজন সর্বহারার মহান নেতা মাও সে-তুঙের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথাও স্মরণ করাতে চাই। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, যদি একটি বিপ্লবী দলের বেস পলিটিক্যাল লাইন অর্থাৎ মূল তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, দলের প্রধান রণকৌশল ঠিক থাকে তা হলে একটি ছোট দলও অনিবার্য ভাবে যথাসময়ে বড় দলে পরিণত হবে। অপরদিকে যদি বড় একটি বিপ্লবী দলের বেস পলিটিক্যাল লাইন ভ্রান্ত হয়, তা হলে সেই দল আর বড় থাকবে না, দ্রুত তার পতন ঘটবে, তার হাতে রাষ্ট্রশক্তি থাকলেও তার অধঃপতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

একই সঙ্গে আমি এই কথাটাও স্মরণ করাব যে, আজ আমরা কিন্তু একেবারে শৈশব অবস্থায় নেই। সারা দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে লাগাতার গণআন্দোলন পরিচালনা করে সাংগঠনিক ভাবে বেশ কিছুটা শক্তি আমরা সঞ্চয় করেছি। আরএসএস-বিজেপি সহ প্রতিপক্ষ অন্যান্য পুঁজিপতি দলগুলিও আমাদের শক্তিবৃদ্ধি টের পাচ্ছে এবং আমাদের শক্তিবৃদ্ধি আটকে দেওয়ার জন্য তারা সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও জোরালো আক্রমণ হানবে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এদের আক্রমণ প্রতিহত করার একটিই পথ, লাগাতার গণআন্দোলন পরিচালনা করে জনগণের মনে আমাদের স্থান ক্রমাগত সুদৃঢ় করা। আরএসএস-বিজেপির এই অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী উত্থানকে আমাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তুলে প্রতিহত করার অপরিহার্যতাকে উপরোক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেই উপলব্ধি করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার ঐতিহাসিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৩তম স্মরণ বার্ষিকীতে এটাই হোক আমাদের বিশেষ সংকল্প। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি আমাদের আবেদন, আরএসএস-বিজেপির উত্থানকে প্রতিহত করার এই ঐতিহাসিক সময়ে আপনারাও আত্মত্যাগের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসুন। স্মরণ দিবসের এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

রোমিলা থাপারকে সরানোর চক্রান্ত

তীব্র নিন্দা এআইডিএসও-র

দিল্লির জে এন ইউ কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রোমিলা থাপার সহ ১২ জন এমিরিটাস অধ্যাপককে তাঁদের সি ভি (যোগ্যতা জ্ঞাপক প্রমাণপত্র) জমা দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র ২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা করেছেন। অধ্যাপক থাপার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি সিভি জমা দেবেন না। অবসরের পর খ্যাতনামা অধ্যাপকদেরই এমিরিটাস অধ্যাপক হিসাবে সম্মানজনকভাবে নিয়োগ করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। এমিরিটাস অধ্যাপকরা তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষাগত উৎকৃষ্টতা দিয়ে কাজ করে থাকেন। তাঁদের এ ধরনের চিঠি পাঠানো চূড়ান্ত অসম্মানজনক। বর্তমানে ৮৭ বছর বয়সেও তিনি সক্রিয়ভাবে গবেষণা, শিক্ষাদান, বই লেখা, বহু ওয়ার্কশপ পরিচালনা যোগ্যতার সাথে করে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তাঁর যোগ্যতা নথিভুক্ত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ চাইলেই তা দেখতে পারে। তা সত্ত্বেও সি ভি দেওয়ার ফরমান কেন?

বিবৃতিতে অশোক মিশ্র বলেছেন, অধ্যাপক থাপার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীতির ঘোরতর বিরোধী। বিজেপি-আরএসএস কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহার করে যেভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে তিনি তার তীব্র সমালোচক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার হরণের বিরোধী। গেরুয়া শিবিরের অপকর্মের সামনে তিনি এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এঁদেরকে সরিয়ে দেওয়াই বিজেপির হীন মতলব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কমরেড মিশ্র আহ্বান জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ পুঁজিমালিকদের স্বার্থেই

তিনের পাতার পর

টাকা নতুন করে ব্যাঙ্কগুলিকে দিচ্ছে, যাতে এনপিএ-র ধাক্কা সামলে ব্যাঙ্কগুলি আবার পুঁজিপতিদের ঋণ দিতে পারে। কিন্তু যে ব্যাঙ্ক সামান্য কয়েক হাজার টাকা ঋণ আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করে, তারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে পুরনো ঋণ আদায়ের কথা তুলছেই না। সরকার নতুন দেউলিয়া আইনের অজুহাতে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ আদায়ের জন্য পাঠাচ্ছে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে। বিজেপি সরকারের নির্দেশে ট্রাইবুনাল ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য করছে ঋণের বড় অংশ ছেড়ে দিয়ে পুঁজিপতিদের সাথে একটা সমঝোতা করে নিতে। ব্যাঙ্কে থাকা গরিব জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকা এই পথে বেশি বেশি করে ঢুকছে পুঁজিপতিদের সিন্দুকে। এর ফলে যে এনপিএ-র ভারে নুব্জ্য দুর্বল ব্যাঙ্কগুলির দায়ের বোঝায় অপেক্ষাকৃত সবল ব্যাঙ্কগুলিও ডুবতে পারে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করছে ব্যাঙ্ককর্মী সংগঠনগুলি। সরকারের তাতে কী? তারা যাদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করে সেই একচেটিয়া মালিকদের লাভ হলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ। দেশের অধিকাংশ মানুষের সঞ্চয়কে সরকার ভারতের একচেটিয়া মালিকদের হাতে পুঁজি হিসাবে তুলে দিতে চাইছে। এই একজোট করা পুঁজির জোরে এদেশের একচেটিয়া মালিকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী নখ-দাঁত আরও তীক্ষ্ণ করে এশিয়া আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বড় সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর হিসাবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায় তারা বিপুল লাভ ঘরে তুলবে। বিনিময়ে গোটা ভারতের জনগণ বিশ্বের শোষিত শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপের ভাগী হবেন। বিজেপির উপহার দেওয়া তথাকথিত 'শক্তিশালী ব্যাঙ্ক' দেশের মানুষের কোনও উপকার করবে না, করবে এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণির। তাছাড়া এই পথেই একদিকে সরকার ব্যাঙ্কে তার নিজের শেয়ার কমাতে কমাতে ব্যাঙ্কগুলিকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে দিয়ে দেবে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারি শেয়ার ৫১ শতাংশ নেমেছে। আরও নামবে বলে ঘোষণা আছে। বিজেপি সরকার এই পথেই এফআরডিআই (ফিনান্সিয়াল রেজোলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স)-এর মতো মারাত্মক বিলকেও ওই সংযুক্তিকরণের পর সংস্কারের অজুহাতেই চালু করার চেষ্টায় আছে। এই অপচেষ্টারই অপর নাম ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ।

প্রকাশিত হল

অনুশীলন সম্পর্কে

মাও সে-তুং

দাম ঃ ১০ টাকা

সংগ্রহ করুন

বিজেপি সরকারের গ্যাসে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

গরিবি-বেকারিতে জেরবার জনগণ

একের পাতার পর

তেল-গ্যাসের ব্যবসার বেশিরভাগটাই তাদের হাতে তুলে দিয়েছে আগেই। নতুন জমানার প্রথম ১০০ দিনে মোদিজি তার সঙ্গে যোগ করেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিটা নিঃশব্দে লোপাট করে দেওয়ার কারসাজি।

আর কী করেছেন? শ্রম আইন সংস্কার করে মালিকদের হাতে ইচ্ছামতো ছাঁটাই করা, বেতন কমানোর অধিকার দিয়েছেন। ইএসআই তুলে দেওয়ার পথে হেঁটে, পিএফের জমা টাকা মালিকদের লাভের জন্য খাটানোর ব্যবস্থা করে তাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। মালিকদের জন্য মোদি সাহেবদের ১০০ দিনের সাফল্য সত্যিই বলবার মতো। বিগত পাঁচ বছরে তাঁদের জমানায় ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে জমা হয়েছে দেশের সম্পদের ৭৭ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষ অতল দারিদ্রের গহ্বরে নিমজ্জিত। নতুন দফার ১০০ দিনে এই বৈষম্য আরও বাড়ছে। সাধারণ মানুষের হাতে সামান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনারই টাকা নেই। শিল্পদ্রব্য কিনবে কে? চাহিদা নেই বলে সারি সারি কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। বেড়ে চলেছে জনজীবনের সংকট। অর্থনীতি মন্দার করাল গ্রাসে। গাড়ি শিল্পেই ১০ লক্ষ লোক ছাঁটাইয়ের কোপে, রেলে সরকার নিজে সাড়ে তিন লক্ষ কর্মচারীকে ছাঁটাই করছে। এর মধ্যেই ১৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে শেয়ার বাজার (ইকনমিক টাইমস ডট কম ৯ সেপ্টেম্বের ২০১৯)। ফলে ছাঁটাই আরও বাড়বে। চাষে এমনিতেই সংকট, এর উপর নানা জায়গা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরতে শুরু করায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে বেকারি মারাত্মক বাড়ছে। ৪০ কোটির বেশি শ্রমিক অতি সামান্য মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। সেই মজুরি এত সামান্য যে নেই বললেই হয় (পিইউ রিসার্চ সেন্টার,ওয়াশিংটন, মার্চ ২০১৯)। ভক্তের দল আওয়াজ তুলেছে 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'— মোদি থাকলে সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! কিন্তু মোদিজি থেকে শুরু করে অমিত শাহ কিংবা তাঁদের অর্থমন্ত্রী— সকলের ভাব দেখে মনে হয় তাঁরা এত মহান চিন্তায় ব্যস্ত যে, দেশের মানুষের খাওয়া-পরার মতো তুচ্ছ বিষয়ে তাঁদের ভাবতে বলাই অপরাধ!

তাহলে ১০০ দিনে কিছুই কি করেননি তাঁরা? অবশ্যই করেছেন। এক মাসের বেশি হয়ে গেছে কাশ্মীর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফোন বন্ধ, খবর আদানপ্রদান বন্ধ, স্কুল-কলেজ বাজার-হাট, হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিষেবা সব বন্ধ। যতটুকু খবর বাইরে আসছে তাতে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কোনও লক্ষণ কাশ্মীরের নেই। কাশ্মীর নিয়ে সারা দেশে বিজেপি এত লম্ফঝম্প করছে, অথচ কাশ্মীরের মানুষের মত নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর একবারও মনে হল না। গণতন্ত্র ফেরানোর চেষ্টা দূরে থাক, সামরিক বাহিনীর দাপটের উপরই ভরসা সরকারের। আসামের ১৯ লক্ষের বেশি ভারতবাসীকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিয়ে সারা দেশে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভেদের জিগির তুলতে ব্যস্ত বিজেপি সরকার। ত্রিপুরায় এর মধ্যেই বিজেপি সরকার এই ডামাডোলের সুযোগে গরিব মানুষের হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত, সার্বজনীন শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিতে ১০০ দিনের 'সাফল্যে' যোগ হয়েছে সর্বনাশা শিক্ষানীতি।

নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহদের কথা থেকে আবার একটা সত্য সামনে এল, কোনও কিছু গড়া সময়সাপেক্ষ, ভাঙাটা সহজ। বিজেপির বেতনভোগী এবং প্রসাদভোগী 'ভক্ত'বাহিনী এই দুই প্রধান কুশীলবের আস্ফালনের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানুষে মানুষে ঐক্য ভাঙতেই ব্যস্ত। তাই বহু বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যকেও অল্পদিনেই ভাঙতে নেমেছেন তাঁরা। ভোটের আগে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিলেন তাঁরা। জেতার পর, ১০০ দিনের মধ্যেই 'বিজেপি ভক্ত'বাহিনী নবজাগরণের উদগাতা রামমোহনকে ব্রিটিশের দালাল বলেছে। বিজেপির জয়রথের ধাক্কায় কাশ্মীরে, আসামে মানুষের ঘর ভেঙেছে। সারা দেশে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে তারা ভাঙছে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের জীবনের সুস্থিতি। তাকতদার বটে!

ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি

একের পাতার পর

যায়। তৃতীয়ত, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টানেল খননের গতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রেও জরুরি কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। সংবাদে এ-ও প্রকাশিত যে, টানেল খননে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। চতুর্থত, বালিস্তর খুবই বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও এই স্তর দিয়েই টানেল করা হল কেন?

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের দাবি— ১) ভূগর্ভস্থ টানেলের কারণে মালিক ও ভাড়াটে সহ বিপর্যস্ত সমস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ২) ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কোনও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা যাতে না থাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com